সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতি ও তার বিবর্তন

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধীন
পি এইচ. ডি ডিগ্রির জন্য
প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের
সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

দিলীপ কুমার বাড়ী

বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিম মেদিনীপুর

২০১৬

।।প্রস্তাবনা।।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তের সুবর্ণের নদী প্রবাহিত। নদীটির উৎপত্তিস্থান ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে। নির্দিষ্টভাবে রাঁচী থেকে অনতিদূরে, সারেঙ্গা পর্বতমালার অন্তর্গত সোনাহাতু গ্রাম থেকে উৎপন্ন হয়ে ঝাড়খন্ডের ধলভূম, মানভূম, ঘাটশিলা উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোপীবল্লভপুর থানায় পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রবেশস্থানের কিছু পূর্ব থেকেই এই নদী উভয় তীর পলিময় ভূমি। এই পলিমিশ্রিত মৃত্তিকা কৃষির উপযুক্ত।

সুবর্ণরেখা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৮০ কিমি। উচ্চ অববাহিকার বিস্তার প্রায় ২৫২ কিমি। পাহাড়ী, ভঙ্গুর অরণ্য ভূমি। অধিবাসীদের মধ্যে জনজাতির প্রাধান্য। কোল, সাঁওতাল, মুন্ডা, শবর। সাঁওতালী-মুন্ডারী-কোলীয় ভাষা এদের মধ্যে প্রচলিত।সাংস্কৃতিক জীবনে এরাই মুখ্য পরিচালিকা।

নদীর নিম্ন অববাহিকর কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের গোপীবল্লভপুর, সাঁকরাইল, কেশিয়াড়ী, নয়াগ্রাম ও দাঁতন থানার বিস্তীর্ণ এলাক। বঙ্গপসাগরে পড়ার আগে কিছুপথ উত্তর বালেশ্বর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে এই নদীর গতিপথ বর্তমানে তিনটি রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সুবর্ণরেখা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৩ কিমি। ওড়িশায় তার দৈর্ঘ প্রায় ৮৫ কিমি।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ পত্রের ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি লিপিবদ্ধ করলাম।

১। আলোচনার পরিসীমা ঃ

আলোচ্য সমিক্ষার ক্ষেত্রে আমার অনুসন্ধানের বিষয় গুলিকে নানা ভাবে চিহ্নিত করেছি।

ক) এলাকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার রূপটির পরিচয়-তাদের দৈনন্দিন জীবনের বিশ্বাস সংস্কারেরযথার্থ রূপের ধারণা সংগ্রহ। এরিমধ্যে তাদের ধর্মবিশ্বাস, দেবদেবীপূজা, দৈনন্দিন জীবনের আচার আচরণ, উৎসব-পার্বণের বিবরণ সংগ্রহ।

খ) এই অঞ্চলের জীবন যাত্রার মৌখিক সাহিত্যধারার পরিচয়।

গ) অঞ্চলটির অধিবাসীদের ভাষারূপের পরিচয়ে সংগ্রহ।

২। সমীক্ষা কাজের উদ্দেশ্য ঃ

বিশেষ এলাকার সংস্কৃতির পরিচয় সংগ্রহ করাই সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

৩। বিশেষ উদ্দেশ্য ঃ পন্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ এই এলাকার সংস্কৃতিকে মিশ্র বা সমন্বয়ী সংস্কৃতি বলে আক্ষ্যা দেন। এক অর্থেই সংস্কৃতিতে মিশ্রণের সম্ভাবনা যথেষ্ট। আমি এই মিশ্রণের রূপটি নির্ধারণে উদ্যোগী।

৪। **সমীক্ষা কাজে অনুসণীয় পদ্ধতি প্রকরণ ঃ**

আলোচ্য অঞ্চল এখনো এক বিশেষ লোকসংস্কৃতি অঞ্চলের অন্তর্গত। সুতরাং ক্ষেত্রসমীক্ষা অমাদের উদ্দেশ্য সাধনের প্রাথমিক উপায় হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

৫। **প্রাথমিক ভাবে অনুমিত অভিমত** ঃ-

মনেহয় ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে জাত ও পুষ্ট এই নদীকেন্দ্রীক সভ্যতার সংস্কৃতি, প্রধানতঃ অরণ্যবাসী জনজাতিদের দ্বারা সৃষ্ট।

৬। **কাজের পরিকল্পনা** ঃ

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ লেখার ক্ষেত্রে কয়েকটি আধ্যায় বিভাজনের ভিত্তিতে চিহ্নিত করেছি।

ক) সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী এলাকা সমুহের জনসংখ্যা, জনবিন্যাস ও জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয়।

খ) আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে জনজাতি-সংস্কৃতির বিবর্তন।

গ) সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতির সমাজ ও তার সামগ্রিক পরিচয়।

ঘ) সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে আধুনিক বৃহৎ বঙ্গ-সংস্কৃতির মধ্যে জনজাতি-সংস্কৃতির স্বসতন্ত্র্য বিচার।

ঙ) উপসংহার।

।। প্রথম অধ্যায় ।।

সুবর্ণরেখার তীরবর্তী এলাকা সমূহের জনসংখ্যা, জনবিন্যাস ও জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয়।

দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য নদীর নাম সুবর্ণরেখা। ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও ওডিশার সীমান্ত এলাকার নদী সুবর্ণরেখা। ঝাড়খন্ডের রাঁচী জেলা থেকে এর উৎপত্তি। জামশেদপুর, চান্ডিল, ঘাটশিলা, ধলভূমগড় পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গোপীবল্লভপুর, সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম ও দাঁতনের জলবিভাজিকা, বালেশ্বরের সমুদ্রসংগম। ঝাড়খন্ডের রাঁচি, জামশেদপুর ইঁচাগড়, চান্ডিল, মানভূম, সাঁকচি, ঘাটশিলা, মহুলিয়া, মুসাবনি, বহড়াগোড়া, মানুষ মুড়িয়া, ডোমজুড়ি, পাঁচান্ডো এবং ওডিশার জামশোলাও এই নদী অববাহিকা অঞ্চলের অন্তর্গত। সুবর্ণরেখা অববাহিকা অঞ্চলে বিভিন্ন জনজাতিদের বসবাস। যেমন সাঁওতাল, কোল, ভূমিজ, মুন্ডা, কোড়া, লোধা, শবর, মাহালি। বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ধীবর, কামার, কুমোর, কুড়মি, বাগাল, হাড়ী, ডোম, মুচি, মেথর, যুগী, কৈবর্ত্য, মাল, মাঝি, নমশূদ্র, শুঁড়ি, মাহিষ্য চাষা, বৈদ্য, কায়স্ত, তেলি, করণ, রাজু, সদগোপ, উৎকলীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। বিশেষ ভাবে বলা যেতে পরে অববাহিক অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জনজাতিদের বসবাস।

সাঁওতালি ভাষায় স্বর্ণজ্ঞাপক শব্দ সানাম্। কোলীয় ভাষায় বেশি প্রচলিত। নদীর উৎসভূমিতে রাঁচির সোনাহাতু একটি সাঁওতালি অদ্ধুষিত গ্রাম। স্বর্ণস্মৃতি বহনে আরও প্রামান্য রয়েছে, সোনাকনিয়া(দাঁতন), সোনারিমারা (গোপীবল্লভপুর-১নং ব্লক) সোনামুখী (রামনগর) প্রভৃতি সীমাখন্ডের গ্রামের নাম। তাছাড়া সুবর্ণ নামটি বড় বেশি অভিজাত।

ময়ূরভঞ্জে সুবর্ণরেখা নদীর অন্য নাম শবররখা। শবররখা - সুবন্নখা - সুবর্ণরেখা। শাবরী ভাষায় নেকা নদীবাচক শব্দ। অতীতে হয়ত নদীর নাম ছিল সাবরনেকা (শাবরী নদী)। স্বর্ণস্মৃতি ও সংস্কৃতায়নের ফলে অভিজাত রূপ নিয়েছে। সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চল অনেক সময় রাজনৈতিক অস্থিরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে বহু জন জাতিই এই অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় । অন্য দিকে সুবর্ণরেখানদীর অববাহিকা অঞ্চল শস্য-শ্যমলা-বসুন্ধরা। তাই জনজাতি ব্যাতিত অন্য বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যাক্তিরা এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে দেয়।

।।দ্বিতীয় অধ্যায়।।

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে জনজাতি-সংস্কৃতির বিবর্তন।

জনজাতি সংস্কৃতির কথা আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই 'জন' কথাটি বলতে ঠিক কী বোঝায় তা আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে মনে রাখা দরকার 'জন' শব্দটি একটি পরিভাষি শব্দ জনসমাজ বা জনগোষ্ঠী 'জন' শব্দটির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। সাধারণ গ্রামীন কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠীই এর অন্তর্গত। এদের অধিকাংশই নিরক্ষর অথবা অল্প-স্বল্প অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। কর্মক্ষেত্রে পরিবেশগত কারনে অথবা জীবিকার প্রয়োজনে এরা গোষ্ঠীগত সংহত সমাজের অধিকারী। এই ধরনের জনগোষ্ঠী অবশ্যই আদিম সমাজের স্তর অতিক্রম করে এসেছে। কিন্তু নাগরিক সমাজের প্রতি সভ্রমসূচক দূরত্ব রেখে চলে। আবার উন্নতির কারণে ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। সাধারণভাবে এই ধরনের সমাজের সৃষ্ট সংস্কৃতি হলো জনজাতি-সংস্কৃতি । এই বিশেষ সমাজের সংস্কৃতির রূপও লালন ক্ষেএ অভিজাত সংস্কৃতির ধার ধারে না। আবার এই ধবনের সংস্কৃতির মাঝে মাঝে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। প্রকৃতির একান্ত সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা মানুষ বাঁচার প্রেরণায় পশুপালন করে। মাঠে ফসল ফলায়, বনে কাঠ কাটে, নিরাপদ স্থানে প্রয়োজনে ঘর বাঁধে , নদীতে মাছ ধরে, পশূ শিকার করে, আরও কত কী কাজ করে তারা। এসব কিছু তাদের বাঁচার জন্য প্রয়োজনের কাজ। এর পাশাপাশি চলে চিরন্তন সৃষ্টির কাজও। এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে এই সব সমাজের সংস্কৃতি। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল জানজাতি সংস্কৃতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত।

নদীর তীরে পলিমিশ্রিত উর্বর ভূমিতে কিছু অংশ বনভূমি। এই বনভূমিতে শাল, মহুল, কেন্দু মূল্যবান বৃক্ষ, যা মূল্যবান কাঠের যোগান দেয়। কোথাও কোথাও এই অরণ্য বন্য পশুকূলের স্বাভাবিক বাসভূমি। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে বনভুমির অংশ কমতে শুরু করেছে। মুল্যবান পুরানো গাছ প্রায় হারিয়ে গেছে। তবে পুরানো গাছের মূল থেকে গজিয়ে ওঠা চারাগাছের অরণ্য তখনকার বনভুমির স্মৃতি বহন করে। বর্তমানে সরকারী উদ্যোগে নতুন করে বনসৃজনের ও সংরক্ষনের প্রক্রিয়া বনভুমিকে হারিয়ে যেতে দেয়নি। বেশ কিছু বছর ধরে খদ্যের সন্ধানে দলমা হাতির দল প্রায়ই এই অঞ্চলে কিছুকাল ধরে দাপিয়ে বেড়ায়।

নদীর নিম্ন অববাহিকার বেশিরভাগ অঞ্চল উর্বর কৃষিজমি। ধান, পাট, আখ ও নানাজাতীয় ডালশস্য, তৈলবীজ শীত ও গ্রীষ্মের নানান শাকসব্জি চাষ হয়ে

থাকে। এখানকার বেশ কিছু আদিবাসী কৃষির উপর নির্ভর করে সংসার চালিয়ে থাকে। তবে সভ্যতার অগ্রগতি ও নাগরিক সংস্কৃতির আকর্ষণে কৃষি পূর্বের মহিমা হারিয়ে ফেলেছে। শিক্ষিত লোকেরা যোগ্যতা অনুসারে চাকুরি যোগাড় করতে আবশ্যিকভাবে শহরবাসী হয়ে পড়েছেন। ফলে নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলিতে চাষের আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে চাষ-বাস চালু হয়নি। নিম্ন অববাহিকা বিস্তীর্ন অঞ্চলে জামশেদপুর ব্যতীত চান্ডিল, ঘাটশিলা, জামশোলা, বহড়াগোড়া, নয়াগ্রাম, দাঁতন, গোপীবল্লভপুর ও জলেশ্বরের মতো গঞ্জ ছাড়া বড় শহর নেই। উৎপন্ন কৃষিজ ফসল নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে বিক্রয় হয়। এই কৃষকেরা ঐ সমস্ত কেন্দ্রে তাদের জীবনযাএার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে থাকে। এই ভাবেই অর্থনীতির ধারা প্রবাহিত।

অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত এই নদী অববাহিকা অঞ্চলটিও ব্রিটিশ ও ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। তা সত্ত্বেও এতদ্ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী সনাতনী সংস্কৃতির উপর তেমনভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। সম্প্রতি একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিছু কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির দখলে চলে যায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূভাগ। পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশা, ঝড়খন্ডের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে এদের প্রাধান্য বেশি পায়। কিছু সময় ধরে সরাকরী নিয়ন্ত্রের বাইরে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত সরকারী হস্তক্ষেপে সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ফল স্বরূপ সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এতদ সত্ত্বেও জনজাতি-সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যগত ঐক্যের সূত্রে অপরিবর্তিত থেকেছে।

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

সুবর্ণরৈখিক জনজাতী-সংস্কৃতির সমাজ ও তার সামগ্রিক পরিচয়

এই অঞ্চলের মানুষের জীবনের সংস্কৃতি এখনকার মেলা পূজপার্বণ, ব্রতানুষ্ঠানকে ঘিরেও আবর্তিত। অত্যাধুনিক যুগে যেখানে পুজাপার্বণ ও ব্রতানুষ্ঠান অবহেলিত, সেখানে এই অঞ্চলের মানুষ অদ্যাবধি এগুলিকে রক্ষা করে চলেছে। মেলা মানুষের মিলনক্ষেএ একথা সর্বজন বিদিত। আধুনিক যুগের মেলায় সেই মিলনক্ষেএ হৃদয় বিনিময়ের বদলে ব্যাবসাটাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এতদ্ অঞ্চলে আজও মেলার মধ্যে ব্যাবসাকে গৌণ করে দেখে মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয় বিনিময়ই মূল লক্ষ্য। মেলা, পূজাপার্বণ , ব্রতানুষ্ঠানগুলিকে ঘিরে এ অঞ্চলের মানুষের প্রাচীন বিশ্বাস, সংস্কারের সঙ্গে আদিম ও অনাবিল আনন্দটি লক্ষ্যনীয় বিষয়।

সনাতন ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলাদেশের সমাজ জীবনে লোকাচার মানুষের জীবনকে দীর্ঘকাল ধরে নিয়ন্ত্রন করে আসছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই অঞ্চলের মানুষের আষ্টেপৃষ্টে ও সেই লোকাচারের বেড়ি। লোকাচার, পুরানো বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে জাত বলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জীবন চর্চাও সেই বিশ্বাস ও সংস্কারকে খুব বেশি পরিবর্তন করতে পারেনি। আইক্ষন, বেকড়াপড়া, নলপুজা, অমবস্যা, ভাইফোঁটা, নবান্ন, ক্ষনই পূজা, বাণমারা, অশুভ শূন্য কলসী, ভূত পেতে বিশ্বাস, মা বাবার অভিশাপে বিশ্বাস প্রভৃতি অবস্ত্র লোকাচার ও বিশ্বাস এখানকার মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপকে নিয়ন্ত্রন করে .। এর থেকে বাইরে আসার প্রবণতা যেমন মানুষের মধ্যে দুর্লক্ষ্য তেমনি এ অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষেদের পর্যন্ত এর কাছে সংস্কার বশে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন ।এর থেকে বুঝি লোকাচার ও লোকবিশ্বাস কী দারুন বন্ধনে এ অঞ্চলের মানুষকে অদ্যাবধি নিয়ন্ত্রন করে চলেছে।

সমাজ সচেতন মানুষের শিল্পবোধ একটা সহজ স্বাভাবিক বৃত্তি। গুহাবাসী অরন্যবাসী মানুষের ও শিল্প চেতনার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ অঞ্চলের মানুষ গৃহনির্মান শিল্প, পোড়ামাটির ভাস্কার্য, পুতুল, শিল্প, পটশিল্প, শোলাশিল্প, বড়ি শিল্প, আলপনা, ঝুড়ি বোনা প্রভৃতির দ্বারা মনন, সৌন্দর্যবোধ ও জীবন ভীক্ষার পরিচয় বহন করে চলেছে। সৌন্দর্যবোধের পরিচয় সকল শিল্পে বিবৃত হলেও মানুষ সামাজিক ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শিল্প কর্মে আধুনিক রূপের ছোঁয়া লাগছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে তারা কখনোই বা ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হন না। এর দ্বারা পুরাতন ধারার প্রতি তাঁদের যেমন মমত্ববোধ প্রকাশিত, অন্যদিকে শিল্পের আদিরুপকে অস্বীকার না করা। অর্থাৎ পুরাতনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রবনতার কথা স্মরন করিয়ে দেয়। শিল্পবোধ

ভিন্ন এই অঞ্চলের মানুষের মনে খেলাধূলার অঙ্গসঞ্চালন মূলক লোকশিল্পের ধারা লক্ষনীয়। খেলাধূলার মাধ্যমে লৌকিক ও পৌরানিক জীবনকে মানুষ বিষয় হিসেবে এখানে গ্রহণ করেন। এছাড়া পৌরানিক কাহিনীর আদলে লৌকিক জীবনকে তাঁরা অভিনয়ের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করে লোকায়ত জীবনকেই মুর্ত করে তোলেন।

সাধারণভাবে মানুষের পরিচয় তার দৈনন্দিন জীবযাত্রা, আচার ব্যবহার, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, খাদ্যাভাস, অবসর বিনোদন, কথাবার্তায় পাওয়া যায়, তাকেই আমরা সংস্কৃতি বলতে পারি। পারিভাষিক অর্থে বিশ্বভুবনে মানুষের করা বা গড়া যা কিছু, তাই তার সংস্কৃতি। অভিমতটি যথার্থ। চোখে দেখা এই জগতে প্রকৃতির গড়া বহু কিছু আমাদের নজরে আছে। এতে বাতাস, ঝড়-বৃষ্টি, প্রাকৃতিক নানা অবস্থাও অর্ন্তভুক্ত। এর বাইরে মানুষ তার বসবাসের জন্য ঘর বানিয়েছে নানান আকারে, নানান উপাদানে। জীবনদায়ী বর্ষার জল খাল-বিল-নদী-নালায় প্রবাহিত হয়ে ভূভাগ ওভূগর্ভে সঞ্চিত, মানুষ পুকুর, কুয়া, নলকূপের সাহায্যে তাকে নিজেদের ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছে। শুধু খাওয়া শোয়া জন্ম মৃত্যুতেই মানুষের পরিচয় নয়, সে জ্ঞান চর্চা করেছে, শিল্পচর্চা করেছে, অবসর বিনোদনের নানা উপায় বার করেছে, শরীর চর্চা, খেলাধূলার নানা পদ্ধতির আবিষ্কার করেছে, প্রয়োগ করেছে। তারা সমাজ গড়েছে, সমাজের জন্য কিছু নিয়ম নীতি চালু করেছে। এ সবই প্রকৃতির বুকে মানুষের সৃষ্টির নিদর্শন। এ সব কিছু, যা মানুষের গড়া এতেই তার সংস্কৃতির পরিচয়। সাহিত্য সমাজের সৃষ্টি, সমাজের পরিচয় তার সংস্কৃতিতে ধরা পড়ে। সেই দিক থেকেই সংস্কৃতির পরিচয় পর্যালোচনার প্রাসঙ্গিকতা।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভৌগলিক পরিবেশ ও ব্যক্তির জাতিগত সত্তার ভুমিকা স্বীকার করতে হয়। প্রাকৃতিক অবস্থান, মাটির প্রকৃতি,তার জীবনযাত্রার পরিচালক। আমাদের আলোচ্য এলাকার কিছু অংশ অরণ্যময় লাল কাকুরে মাটি এলাকা, অন্য অংশ অবশ্য পলিগঠিত মৃত্তিকা অঞ্চলে, এ অবস্থায় দুই ধরনের মানবসমাজ এখানকার বাসিন্দা। একদল অরন্যবাসী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় মানবগোষ্ঠীর উত্তরাধীকারী। এঁরা পরিবর্তনের ধারাকে মান্যতা দেখালেও পূর্বপুরুষেরা ঐতিহ্যকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে চলেছেন। সময়ের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমানের সাথেও তাদের চলতে দেখা যায়।

আমার গবেষণার বিষয় সুবর্ণরৈখিক জনজাতি-সংস্কৃতি ও তার বির্বতন। আমি যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে এই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করে চলেছি। বিষয় নির্ভর আলোচনার থেকে এ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর জোর দিয়েছি। সেগুলি ক্রমপর্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে শ্রেণীবিভাগ করতে পারি।

১। ভাষাগতা বৈচিত্র্য
২। উৎসব-অনুষ্ঠান
৩। লৌকিক দেবদেবী
৪। বিনোদন

(লোকক্রীড়া, লোকনৃত্য, লোকশিল্প, লোকবিশ্বাস)
এই বিবাগের সমস্ত উপবিভাগগুলিকে আমি গবেষণাপত্রে বিস্তারিতভাবে আলোচনার চেষ্টা করেছি।

।। চতুর্থ অধ্যায়।।

সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকা আঞ্চলে আধুনিক বৃহৎ বঙ্গসংস্কৃতির মধ্যে জনজাতি-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য

সুবর্ণরেখা নদী অববাহিকা অঞ্চল বর্তমানে তিনটি রাজ্যের সীমানা বরাবর অবস্থিত। ফলে এই অঞ্চলের জনজাতিদের মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃতিতে মিশ্র রূপ লক্ষ্য করা যায়। সভ্যতার অগ্রগতি ও নাগরিক সংস্কৃতির প্রাধান্যে সুবর্ণরৈখিক জনজাতি সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ফলস্বরুপ জনজাতির লোকেরা প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সম্পূর্ন ভাবে ভূলে গিয়ে আধুনিকের পথে পা বাড়িয়েছে। এই মতের ভিত্তিতে আধুনিক বৃহৎ বঙ্গ সংস্কৃতির মধ্যে সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী জনজাতি-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানে আগ্রহী হয়েছি। তার সামগ্রিক পরিচয় নিম্নে উল্লেখ করা হল।

বেশ কিছু পর্ব উৎসব এই এলাকার জনজীবনে স্বাতন্ত্রের পরিচয় বহন করে চলেছে। গমা পূর্ণিমা বা ঝুলন পূর্ণেমা বৈষ্ণব সমাজের মান্য তিথি। এই উপলক্ষে রাখী পরানোর আয়োজন রয়েছে। তাই এর নাম রাখী পূর্ণীমা রূপেও পরিচিতি। এদিন এই এলাকায় একটি বিশেষ দিন রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে । এই উপলক্ষে জামাইদের শ্বশুর বাড়ীতে আন্ত্রন ও মর্যাদা লাভ, বঙ্গদেশে প্রচলিত জামাই ষষ্ঠীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমানে কিছুটা হ্রসপ্রাপ্ত হলে ও গমা পূর্ণিমার মাহাত্ম্য আজও পুরোপুরি লুপ্ত হয় নী। দীপান্বীতা কালী পূজার পর দিন পড়ীয়ন উপলক্ষ্যে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের সাজানো, নতুন জামাকাপড় পরানোর রীতি আছে। বাদ্যকারেরা বাড়ী বাড়ী বাজানা বজিয়ে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করে থাকেন। অন্যান্য বাঙালী জাতিগুলিও এতে যোগ দেয়ন। সেই সময়ে বাঁধনা পরব, গোবন্দনা উভয় সম্প্রদায়ের পালনীয় উৎসব। করম, জাওয়া, টুসু মূলতঃ এই অঞ্চলের পরব। চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবদেবীর ব্রত ও পূজা এখানকার সমন্বয়ী সংস্কৃতির কথা মনে করায়। ধর্মঠাকুর রাঢ় অঞ্চলের এবং ডোম জাতির পূজিত দেবতা। পণ্ডিতদের মতে ধর্মঠাকুর শিব ঠাকুরের আধিপত্যে আপন মহিমা হারিয়ে ফেলেছেন। শিবের গাজনের অনুষ্ঠানের মধ্যে অনার্য্য জাতির প্রভাবের স্মৃতি দুর্লভ নয়। এ অঞ্চলে মহাদেবের মন্দির প্রায় সব গ্রামেই রয়েছে। প্রাত্যহিক পূজা অবশ্যই করণীয়। এর পাশাপাশি চৈত্র মাসের গাজন পরব ভক্তদের বিশেষ নিয়ম পালন ও কৃচ্ছসাধনের ভয়ঙ্কর সব পক্রিয়ায় নিম্নবর্ণের লোকেরা সানন্দে অংশগ্রহণ করে থাকেন। গাজন উপলক্ষে আচার ও অনুষ্ঠানে অনুসৃত কার্যগুলি এলাকার স্বাতন্ত্র্য সূচক বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

।।উপসংহার।।

প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সুবর্ণরেখা নদীর সুদীর্ঘ বিস্তীর্ণ গতিপথ ও ভৌগলিক পরিচিতির ঐতিহ্য বিরাজমান। সেই ঐতিহাসিক কাল থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে এলাকার জনজাতি-সংস্কৃতির বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভে অর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে সুবর্ণরৈখিক জনজাতি সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরাই আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিশেষ উদ্দেশ্য।

।। গ্রন্থপঞ্জি।।

১। ঘোষ, বিনয় ঃ- পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশভবন, কলি., ১৯৯২।

২। দাশ, বিনোদ শঙ্কর রায়ঃ- মেদিনীপুর, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, প্রথম খণ্ড।

৩। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ ঃ - পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, প্রথম খণ্ড, পরিবেশক সুবর্ণ রেখা-১৯৯৯ কলি.।

৪। ভট্টাচার্য,তরুণদেব ঃ- পশ্চিমবঙ্গদর্শন, মেদিনীপুর, ফার্মা. কে. এল. এম. প্রা. লি. ১৯৭৯ কলি. ।

৫। মাইতি, বঙ্কিমচন্দ্র ঃ- দক্ষিন-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়াত সংস্কৃতিঃ বিদিশা প্রকাশনী । নারায়ণগড়, মেদিনীপুরঃ ১৩৭৯।

৬। মাহাত, পশুপতি প্রসাদ ঃ- ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ, সুজন পাবলিকেশন কলি. ১৯৯৫।

৭। বায়, প্রণব ঃ,-মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ, প্রত্নতত্ব অধিকার, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পঃবঃ সরকার, ১৯৮৬।

৮। ঘোষাল, ছন্দা ঃ-লোকসংস্কৃতি বিচিত্রাঃ বাঁকুড়া, লোকসংস্কৃতি একাদিমি বাঁকুড়া, ২০০২।

৯। করণ, সুধীর ঃ- সীমান্ত বাংলার লোকযানঃ করুনা প্রকাশনী, ১৪০২কলি.।

১০। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্যও সংস্কৃতি বিভাগ (প্রকাশকঃ- জেলা লোক সংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, মেদিনীপুরঃ লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রঃ মধুসূদন মঞ্চ ঢাকুরিয়া, কলি. ৬৮,২০০২জানুযারী।

।।পত্রপত্রিকা।।

(১)দাস, রমানাথ, অড় (মানভূম লোক সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা) ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৪০৮ পুরুলিয়া।

(২)মিত্র, সনৎ কুমার, লোক সংস্কৃতি গবেষণা (অরণ্য ও লোক সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা), ১৩ তম বর্ষ ৩ সংখ্যা, বইমেলা, লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ।

।।অভিধান।।

১। দাশ, ক্ষুদিরাম (সংকলক), সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান প্রথম প্রকাশঃ আগষ্ট, ১৯৯৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, কলকাতা।

২। মন্ডল, সুশীল কুমারঃ- রাঢ়ের শব্দ ও সংস্কৃতি আভিধান, প্রথম প্রকাশঃ ৬ ডিসেম্বর, ২০০৭, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা।